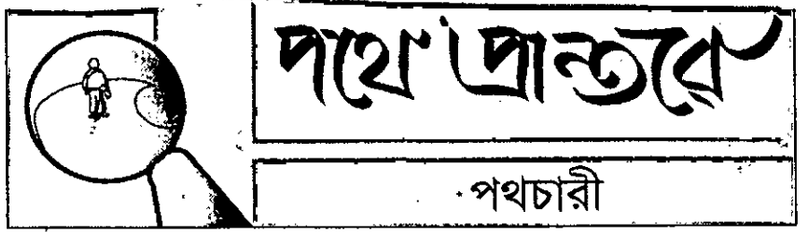

পথে প্রান্তরে

পথচারী

বাংলাদেশ শিক্ষায় এখনো অনগ্রসর

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও গত ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে। এটি জাতিসংঘের ঘোষিত দিবস। বাংলাদেশের মত বিশ্বের যে সমস্ত দেশ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত সে সমস্ত দেশে এই দিবসটির গুরুত্ব অনেক। বাংলাদেশে প্রতি বছর এই দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পালিত হয়। রাজধানী থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা উভয়েই এ উপলক্ষে জনগণের উদ্দেশ্যে বাণী প্রচার করেছেন।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা এখন ১৫ কোটির উপর। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার যত কম হোক না কেন, লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় প্রতি বছর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিপুল সংখ্যায়। বছরখানেক আগে ইউনেস্কোর একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৬ কোটি লোক নিরক্ষর। তার মধ্যে ৪ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ তাদের বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছর। অন্যদিকে ২ কোটি শিশু-কিশোর, যারা কখনো স্কুলের চৌকাঠ মাড়ায়নি। বৃদ্ধদের বাদ দিলে ১৫ কোটি লোকের ৬ কোটিই যদি অক্ষরজ্ঞানহীন হয় তাহলে সমাজে তাদের কী স্থান হতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দেশেরইবা কী অবস্থা হতে পারে? বলা বাহুল্য, আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ খুব ছোট দেশ। শিল্পের তেমন প্রসার ঘটেনি। মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে যা পর্যাপ্ত তা হচ্ছে মানুষ। কিন্তু অন্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশের মানুষও শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারতো। কিন্তু তারা শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার দরুন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি, বরং তারা অনেক সময় উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এ অবস্থা যে কেবল বাংলাদেশের তা নয়, এশিয়া, আফ্রিকাসহ বিশ্বের বহু দেশে নিরক্ষরতাজনিত এ সমস্যা বিদ্যমান। সেজন্যই জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র এ দিবসটি পালনের নির্দেশ দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরক্ষরতার খারাপ দিকটি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলা। কেননা নিরক্ষর লোকেরা যে অনেক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাই নয়, তারা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার পথেও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র নিজের স্বার্থে নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দান করে তাদের অগ্রযাত্রা বেগবান করার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের কৃষক সমাজ, বিশেষ করে মুসলমানরা বৃটিশ আমল থেকে শিক্ষায় পিছিয়েছিল। সেজন্য তারা অগ্রসর হিন্দুদের মত চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে স্থান করে নিতে পারেনি। সে সময় শিক্ষিত জনশক্তি বলতে হিন্দু সম্প্রদায়কেই বুঝাত। সেজন্য ভারত ভাগের পর থেকে মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার

চেষ্টার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও সরকারী উদ্যোগে গত বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলেছে এবং এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জিত হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। বেশী সাফল্য অর্জিত হয়েছে নারী শিক্ষায়। এখন এমন কোন গ্রাম বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে গ্রামে একজন-দু'জন পুরুষ ও নারী গ্রাজুয়েট নেই। সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সহায়তা দেয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে।

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ শিক্ষায় এখনো অনগ্রসর। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যদিও সেখানে ভাল শিক্ষক ও অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। দু'-তিনটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রত্যেক উপজেলায় একাধিক কলেজ রয়েছে। স্কুলে ছাত্রীদের জন্য রয়েছে উপবৃত্তি। বেতন মওকুফ। প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈতনিক। বই ফ্রি। এতসব সুবিধা সত্ত্বেও সব ছেলে- মেয়ে স্কুলে যায় না। যারা যায় তাদের অর্ধেকের বেশী বাড়ীতে ফিরে আসে। এ ড্রপআউটের সংখ্যা এত বেশী যে, যে বিদেশী সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে অর্থ সাহায্য

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য অব্যাহত রেখেছে। অবশ্য এসব প্রকল্পের অধিকাংশ সফল হয়নি। অর্থের অপচয় হয়েছে বলেও বিস্তর অভিযোগ শোনা যায়।

তবে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ড্রপআউটে আমরা বিস্মিত নই। যে ঘরের উপার্জনক্ষম লোকটি কাজ পায় না, ঘরে খাদ্য নেই, ছেলে-মেয়ে একাধিক, তাদের পেট খালি, পরনে ভাল কাপড় নেই, পড়াশুনায় উৎসাহ দেয়ার লোক নেই, বাড়ীর পরিবেশ শিক্ষা সহায়ক নয়, এই বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাবে কি করে? গেলেও থাকবে ক'দিন? ২ কোটি শিশু-কিশোর যারা নিরক্ষর তারা এরা। এদের অক্ষরজ্ঞান দেয়া বা স্কুলে পাঠাতে হলে এদের পিতাদের সর্বপ্রথম কর্মসংস্থান করতে হবে। গ্রামে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, শিক্ষিত মাত্রই তা অবগত। খুব অল্প সময়ে নিরক্ষরদের শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া শিক্ষা মানে তো শুধু অক্ষরজ্ঞান দান নয়। ছাত্রকে লিখতে, পড়তে ও বুঝতে শেখাতে হবে। অর্থাৎ সে যেন তার সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশের সব

কাজেই দু'এক/চার দিন বা দুই/চার-পাঁচ মাসে সম্ভব নয়, এর জন্য কয়েক বছর প্রয়োজন। স্কুলে যাওয়া ও ড্রপআউটের সমস্যা হচ্ছে এজন্য।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা আন্দোলন আশির দশকে জোরেসোরে শুরু হলেও আসলে এর সূচনা হয় দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে। জিয়াউর রহমান সাহেব ১৯৮০ সালে ঘোষণা দিয়ে সারাদেশে সাক্ষরতা অভিযান শুরু করেন। এজন্য সে সময় বয়স্ক শিক্ষার উপযোগী এক কোটি বইও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সাংগঠনিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা যথেষ্ট না থাকায় তার এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তিনি এমন আইনও করেছিলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের দুইজন করে নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করতে হত। এটা পাঠ্যের অংশ। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার-চেয়ারম্যানদের নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দান বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। বয়স্করা নিশ্চয় অবগত এটা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। শেষে ১৯৮৩ সালে এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৭ সালে আবার গণশিক্ষা কার্যক্রম নামে আর একটি প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। তারপরও এ জাতীয় একাধিক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর কোনটার কাজ চলেছে, আবার কোনটার চলেনি।

আগেই উল্লেখ করেছি, যারা স্কুলে যায় তাদের সকলকে বিভিন্ন সুবিধা দিয়েও স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ মানে সরকার ও সাহায্যদাতারা চাচ্ছে তাদের স্কুলে ধরে রাখতে। তারা জোরও দিচ্ছে তার ওপর। সাক্ষরতা অভিযান বা বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারটি এখন গৌণ হয়ে গেছে। বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হচ্ছে, বয়স্করা কাজকর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে তাদের ক্লাসে নিয়মিত পাওয়া যায় না। তারচেয়ে শিশু-কিশোরদের শিক্ষার পেছনে সময় ও অর্থ ব্যয় করা শ্রেয়।

এ ব্যাপারে যে যা যুক্তি দেখাক না কেন, বয়স্ক শিক্ষা একটি বাস্তবতা। বয়স্করা শিক্ষা গ্রহণ করলে তার প্রভাব পড়ে শিশু-কিশোরসহ পরিবারের সকলের উপর। তাছাড়া তারা পারিবারিক সকল কাজকর্ম করে। পরিবারের প্রয়োজনে তাদেরই বেশী অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা প্রয়োজন। সমাজে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতেও তারা অবদান রাখতে পারে। সেজন্য একজন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'বয়স্ক শিক্ষায় যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহল, যে বয়স্ক লোকটি শিক্ষা গ্রহণ করে তার কর্মদক্ষতা বাড়ে, তার জন্য ভাল কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তার আয়-উপার্জন বাড়ে, তার জীবনমানের উন্নতি ঘটে এবং সে প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে সাহায্য করে।' বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এ সমস্ত কারণে অস্বীকার করা যাবে না। তবে এ কাজটি এনজিওদের দ্বারা করাতে হবে।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা আন্দোলন আশির দশকে জোরেসোরে শুরু হলেও আসলে এর সূচনা হয় দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে। জিয়াউর রহমান সাহেব ১৯৮০ সালে ঘোষণা দিয়ে সারাদেশে সাক্ষরতা অভিযান শুরু করেন। এজন্য সে সময় বয়স্ক শিক্ষার উপযোগী এক কোটি বইও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সাংগঠনিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা যথেষ্ট না থাকায় তার এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তিনি এমন আইনও করেছিলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের দুইজন করে নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করতে হত।

দৈনিক ইত্তেফাক